

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের
নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ইমারী



ইসলামের ইতিহাস আর্কাইভ- ২০১৫

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৫ ইসায়ী

সূচীপত্র

ওয়া মুতাসিমাহ! মুতাসিম বাঁচাও!	৪
শহীদ তিতুমীর রহিমাহুল্লাহকে চিনেন ?	৯
মুসলমানদের স্বপ্নের রাষ্ট্র স্পেন	১৫
শামেলী প্রান্তরের তপ্ত বারুদ.....	২৩

ওয়া মু'তাসিমাহ! মু'তাসিম বাঁচাও!

Hazi Shariyatullah

Senior Member

০৭-১৮-২০১৫

আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর রহ. ইতিহাসগ্রন্থ ‘আল-কামেল’ এ উল্লেখ করেন—

মুসলিম জাহানের প্রবল প্রতাপশালী খলিফা মু'তাসিমের কানে যখন রোমানদের হাতে বন্দী এক নির্খ্যাতিতা হাশেমী নারীর বুকভাঙ্গা চিৎকার— ওয়া মু'তাসিমাহ! মু'তাসিম বাঁচাও! আওয়াজ পৌঁছুল তখন খলীফা মু'তাসিম সঙ্গে সঙ্গে লাব্বাইক লাব্বাইক (আমি আসছি আমি আসছি) বলে চিৎকার দিয়ে সিংহাসন থেকে নেমে আসেন। রাজ প্রাসাদের ভিতরেই ‘ঝাঁপিয়ে পড়’, ‘ঝাঁপিয়ে পড়’ বলে বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগলেন। রোমীয়দের হাতে মুসলমানদের ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে রাজ্যের কাজীদের ও উপস্থিত জনগণকে অবহিত করলেন। অতঃপর ক্ষুদ্র একটি বাহিনী নিয়েই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। অসহায় মুসলিম নারীটি যে দুর্গে বন্দী ছিলেন সে দুর্গটির নাম ছিল ‘আমুরিয়া’। খলীফা মু'তাসিম সে দুর্গটি বিজয় করার পর ধ্বংস করে ধূলোয় মিশিয়ে দেন।

এটি ঐ সময়ের কথা, যখন শাসকগণ ইসলামী আদর্শে উদ্দীপ্ত ছিল। নিপীড়িতের জন্য ছিল সুহৃদ ত্রাণকর্তা। আর জালেম ও অত্যাচারীর জন্য ছিল সাক্ষাৎ যমদূত। শাসকরা নিজেদের মনে করত ইসলাম ও মুসলমানের খাদেম ও মুহাফেজ। একজন সাধারণ ব্যক্তি কিংবা অবলা বৃদ্ধাকে রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন ও রাজ্যকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না।

আর মুসলমানরা পৃথিবীর শেষ সীমানা অবধি প্রতিটি দেশে নিশ্চিত্ত নির্বিন্দ ও প্রশান্ত চিন্তে আত্মমর্যাদার সঙ্গে বসবাস করত। সবাই এ বিষয়ে নিশ্চিত্ত ছিল, সে কখনই একা নয়; বরং তার মুসলিম ভাইয়েরা সর্বদা তার পাশে আছে এবং তাকে রক্ষা ও সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। তার সাহায্যার্থে প্রয়োজনে জীবন বাজি রাখার জন্য বদ্ধপরিকর। অন্য দিকে জালেমগোষ্ঠীও ভাল করেই জানত, এদের

কারো প্রতি হাত বাড়ানো মানে ঘুমন্ত শার্দূলকে জাগিয়ে তোলা কিংবা মৌচাকে ঢিল মারা। যারা অন্যায়ের চরম প্রতিশোধ নেয়ার আগ পর্যন্ত শান্ত হবে না, আর আশ্রাসী শত্রু জলে-স্থলে কোথাও পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। মুসলিম জাতির প্রতিটি সদস্যকে ‘একদেহ’ ‘একপরিবার’ রূপে গণ্য করা হত। একজন আক্রান্ত হলে অপরজন সর্বস্ব নিয়ে তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসত।

এতক্ষণ যাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে, তারা ঐ সকল মুসলিম শাসক যাদের অন্যায় ও অবিচারে ইতিহাসের পাতা ভরে আছে। যারা কোনভাবেই ন্যায়পরায়ণ ও সুশাসকের কাতারে পড়ে না। তারা নিজেরাও নিজেদেরকে উত্তম ও ধর্মপ্রাণ মনে করত না; বরং নিজেদের অন্যায় ও অপরাধের কথা অকপটে স্বীকার করত। কিন্তু দেখুন তাদের মাঝেও ধর্মীয় চেতনা এমন পর্যায়ে ছিল যে, তারা তাদের বীর সেনাপতিদের নেতৃত্বে বিশাল বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছে মুসলমানদের একটি বসতি রক্ষার উদ্দেশ্যে কিংবা কিছু ভিনদেশি মুসলিম নারীকে রক্ষার জন্য, দস্যুরা যাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। অথচ সে পর্যন্ত পৌঁছানোর পথ নিষ্কণ্টক ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাঁদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং অসহায় মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি সংবেদনশীলতার কারণে এ অভিযানের মাধ্যমে এক অবিস্মরণীয় বিজয়ের দ্বার উন্মোচন করেন। সূচনা হয় নব যুগের।

ঐতিহাসিক ‘বালাজুরী’ তার অমর গ্রন্থ ‘ফুতুহুল বুলদানে’ লিখেন— ভারত সাগরের উপকূলবর্তী দেবল (বর্তমানে করাচী) বন্দর অতিক্রমকালে একটি আরবীয় বাণিজ্যিক জাহাজ -যাতে নারীরাও ছিল- স্থানীয় জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। জলদস্যুরা জাহাজের যাবতীয় মালপত্র ও যাত্রীসহ জাহাজটি ছিনতাই করে। তখন দস্যুদল কর্তৃক আটক নারীদের একজন যিনি ইয়ারবু গোত্রের ছিলেন, এ বলে আর্তনাদ করেন— হাজ্জাজ তুমি কোথায়? এ খবর শোনামাত্র হাজ্জাজ বিন ইউসুফ লাকবাইক! আমি আসছি বলে হুংকার দেন। অতঃপর সিন্দুর শাসক রাজা দাহিরের কাছে বন্দী নারীদের মুক্তি দেয়ার জন্য লোক পাঠান। কিন্তু দাহির এ বলে তাদের ফিরিয়ে দেয় যে, তারা দস্যু কর্তৃক অপহৃত; তাদের উপর আমার ক্ষমতা নেই। তখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ওবায়দুল্লাহ বিন নাবহানকে সেনাপতি করে দেবলে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু সেনাপতি ওবায়দুল্লাহ যুদ্ধে নিহত হন। তখন বুদাইল বিন তুহফাকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। তিনি নিহত হলে হাজ্জাজ নিজ জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসেমকে সেনাপতি করে সিন্দু অভিযানে

পাঠান। এটা ছিল খলীফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের যুগে। সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের হাতেই সিন্দু বিজয় হয়।

ইসলামী ইতিহাসে এমন অসংখ্য বিস্ময়কর ও দুঃসাহসিক ঘটনা রয়েছে, যাতে ধর্মীয় মূল্যবোধ উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে, যা এ উম্মাহর উপর মহান আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ বৈ কিছু নয়, যার মাধ্যমে উন্নত চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আর এর বিনিময়ে মানব জীবনে আত্মমর্যাদাবোধ ও ইজ্জত-সম্মানের বিকাশ ঘটে। প্রকৃত পক্ষে শহর রক্ষা করা কিংবা মানুষের অধিকার রক্ষা করা মানে পুরো সমাজ ব্যবস্থাকে রক্ষা করা। যারা মানুষের সাথে অমানবিক আচরণ করে, তাদের ইজ্জত-সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, বসত ভিটা থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করে এ ধরনের অসভ্য ও বর্বর শায়েস্তা করা তো মানব সভ্যতা রক্ষার স্বার্থেই আবশ্যিক হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য স্বজাতির স্বার্থে যাদের মাঝে আত্মমর্যাদা বোধ জাগ্রত হয় না- তারা তো ভীক, কাপুরুষ।

আরবের লোকেরা সে জাহেলি যুগ থেকেই আত্মমর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে অতিসংবেদনশীল। তাঁরা আত্মমর্যাদাবোধকে মনে করত নৈতিকতার ভিত্তিমূল। আর যারা স্বজাতির কোন কন্যাকে মরুভূমি কিংবা নির্জন ভূমিতে নির্যাতিত হওয়ার সংবাদ শুনেও তাকে উদ্ধারে বাঁপিয়ে পড়ার তাগাদা অনুভব করে না, তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে বিলম্ব করে তারা অতি নিম্ন প্রকৃতির লোক বলে ধিকৃত হত। এ কলঙ্কের গ্লানি বংশ পরম্পরায় পরবর্তী প্রজন্মকেও বহন করতে হত। তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিষ্ফিপ্ত হত। তাদের এই মূল্যবোধের ভিত্তি ছিল এই হাদীস— **انصر اخاك ظلما او مظلوما** তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর চাই সে জালেম হোক, চাই মাজলুম।

ন্যায় হোক অন্যায় হোক অন্ধ গোত্রপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতার দাবী হল গোত্রের লোকের পক্ষে দাঁড়াতেই হবে, তাকে সাহায্য করতেই হবে। সুতরাং এ নীতি থেকে যারা বিচ্যুত হবে বা ছাড় দিবে তারা সমাজে ধিকৃত হতে বাধ্য। এমনকি তাকে সমাজচ্যুত করে এক ঘরে করে রাখা হত।

বনী শায়বান গোত্রের কিছু লোক বনী আনবার গোত্রের কুরাইজ বিন উনাইফ নামক এক ব্যক্তির উপর আক্রমণ করে তার ত্রিশটি উট লুট করে নিয়ে যায়; কিন্তু এ বিপদের সময় তার গোত্রের কেউ সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেনি। অথচ

জাহেলি যুগে গোত্রের কোন লোক বিপদে পড়লে অন্যরা এগিয়ে আসার চিরায়ত রীতি ছিল। এ ঘটনা সেই গোত্রের কবির হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। তখন সে যে কবিতা আবৃত্তি করে তা পরবর্তীতে সকল মানুষের মুখে মুখে আলোচিত হতে থাকে। কারণ সে একজন প্রথিতযশা কবি ছিল। তার কবিতার চরণগুলো ছিল নিম্নরূপ—

আমি যদি মায়েন গোত্রের হতাম, তাহলে আমার উটগুলো খোয়া যেত না বনু লাকিতাহ জাহল বিন শায়বান এর বংশধর তাহলে আমার দুর্দশায় কঠোর প্রকৃতির লোকেরা এগিয়ে আসত যখন বিপদ তাদের গোত্রের আত্মসম্মানের দিকে হাত বাড়ায়। তারা এমন জাতি, যখন মুসিবত তাদের আঁষ্টেপৃষ্ঠে বেধে ফেলে তারা দল বেঁধে ও বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিআক্রমণ করে গোত্রের কেউ সাহায্যের আবেদন করলে তারা দলিল-প্রমাণের পিছনে সময় নষ্ট করে না তবে আমার গোত্র, যদিও সংখ্যায় অনেক, কিন্তু তাদের আত্মসম্মানে আঘাত আসলেও তারা তা গায়ে মাখে না। বরং তারা অত্যাচারির উপর দয়ালু সাজে- আর মন্দ লোকের দিকে অনুগ্রহের হাত বাড়ায়। সৃষ্টিকর্তা তার সাহায্যের জন্য এসব অর্থ লোকদের ছাড়া আর কাউকে কি সৃষ্টি করেননি! হায় যদি আমার জাতি এমন হত দল বেঁধে তাদের অত্যাচারের সমুচিত জবাব দিবে। ইসলাম এসে জাহেলী রীতি-নীতি যেগুলো ঐতিহ্য রূপে পালনীয় হত- সেগুলো রিসালাতের সাথে সমন্বয় করে তাতে ভারসাম্য সৃষ্টি করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের সম্বোধন করে বললেন, ‘তোমার ভাইয়ের সাহায্য কর- চাই সে জালিম হোক, চাই মাজলুম।’ সাহাবাদের কাছে এ বিষয়টি অস্বাভাবিক মনে হল। কারণ, নববী তা’লীম-তরবিয়তে এতদিন তারা যা অর্জন করেছে এটা তার সাথে খাপ খায় না। তাই তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘মাজলুমকে সাহায্য করার বিষয়টি তো বুঝে আসে; কিন্তু জালেমকে সাহায্য করার বিষয়টি তো বুঝে আসছে না? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইসলামী ব্যাখ্যা দেন এ বলে, জালেমের জুলুমের হাত চেপে ধরবে- যেন সে জুলুম করতে না পারে। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী।

তখন থেকেই মুসলমান জাতি এ আদর্শে উজ্জীবিত, মুসলমান চাই আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, কাছের হোক বা দূরের- মাজলুম হলে তাদের উদ্ধারের জন্য সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেত। আর জালেম হলে তাদের জুলুমের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াত।

অত্যাচার-নিপীড়ন যে ধরনেরই হোক, পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক-তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হত। এক্ষেত্রে জালেমের রক্ত চক্ষুকে পরোয়া করত না। তার নিপীড়নের হাতকে শক্তিশালি করার তো প্রশ্নই আসে না। মোটকথা জালেমের জুলুম মুখবুজে সহ্য করত না। এতে যা হবার হোক। যদি কারো মধ্যে এ মনোভাবের ব্যত্যয় ঘটতো, তাহলে সে গান্ধার ও বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত হত। তাকে ভীৰু-কাপুরুষ বলা হত। অন্যরা তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করত এবং তাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করত। একসময় মুসলিম জাতির ভাগ্যে অমাবশ্যার দুর্যোগ নেমে এল। আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থচিন্তার ভূত তাদের ঘাড়ে চেপে বসল। ক্ষমতা ও রাজত্বের লালসায় তারা বৃদ্ধ হয়ে পড়ল। ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত হওয়া তো দূরের কথা, সাধারণ মনুষ্যত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধেরও অপমৃত্যু ঘটলো। (চলবে)

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩২৩>

শহীদ তিতুমীর রহিমাতুল্লাহকে চিনেন ?

[musafir](#)

Senior Member

০৭-২১-২০১৫

আপনি কি শহীদ তিতুমীর রহিমাতুল্লাহকে চিনেন ?

(এই লেখাটি “titumir media” এর জন্য উৎসর্গিত)

ইবন আদম

পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের কাছে অতি প্রিয় নাম তিতুমীর। স্বাধীনচেতা পালোয়ান তিতুকে অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকরা অসম্ভব ভয় পেত। ব্রিটিশের স্থানীয় জমিদাররা তাঁর নাম শুনে হতো আতঙ্কিত। ব্রিটিশ বেনিয়ার নাগপাশ থেকে এ দেশের অসহায় মানুষকে মুক্তির জন্য তিনি আপসহীন সংগ্রাম করেছেন। সাহসী তিতুমীর ইসলামের ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা, ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার সাধন এবং শিরক-বিদয়াত থেকে মুসলমানদের মুক্তির জন্য আজীবন লড়াই করেছেন। তিতুমীরের এ লড়াই পাক-ভারত মুসলিম ইতিহাসের এক অনন্য বীরত্বগাথা এবং এক গৌরবময় অধ্যায়। মুসলিম মানসপটে শিরহরণস্বধারী এক স্বাঙ্গিক পুরুষ ছিলেন তিতুমীর। তাঁর অসীম সাহস ও ক্ষিপ্ততা আমাদের হৃদয়বেগ প্রাণিত করে। নারকেলবাড়িয়ায় তাঁর ঐতিহাসিক বাঁশের কেলা ইতিহাসের পাতায় এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। মহান শহীদ তিতুমীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু কোন আপস করেননি।

একাদশ শতকে এক ক্রান্তিকাল চলেছে। পাক-ভারত মুসলিম সমাজের তখন ঘোর দুর্দিন। নীলচাষে রাজি না হলে নীল কুঠিয়ালদের চাবুকের আঘাতে গরিব চাষিরা জর্জরিত হতেন। ব্রিটিশ বেনিয়ার তল্লাহবাহক হিন্দু জমিদারগণ খাজনা আদায়ের নামে কৃষকের গরু-ছাগল কেড়ে নিতো। বর্ণবাদী হিন্দুদের অমানবিক আচরণ সহ্যের সীমা অতিক্রম করল। হিন্দুরা মুসলমানদের বোন্দা, গেন্দা, বুটা, চান্দি, গেন্দি, পেন্দি ইত্যাদি উপহাসমূলক নামে ডাকত। কেউ ইচ্ছে করলেই মুসলমানি নাম রাখতে পারত না। এ জন্য জমিদারকে ‘খারিজানা’ খাজনা পঞ্চাশ টাকা দিতে হতো। কেউ দাড়ি রাখতে চায় তো, তাকে খাজনা হিসেবে আড়াই টাকা গুনতে

হতো। গোঁফ ছাঁটতে দিতে হতো পাঁচসিকা। এখানকার মুসলমানরা মসজিদ বানাতে চাইলে তা স্বাধীনভাবে করা যেত না। জমিদারকে নজরানা না দিয়ে কারো মসজিদ বানানোর সাহস ছিল না। জমিদার প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচ টাকা, আর পাকা মসজিদের জন্য এক হাজার টাকা নজরানা নিত। এমনকি কারো সন্তান হলে এর জন্য জমিদারকে কর দিতে হতো। জমিদারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর মুসলমানদের ভাগ্য নির্ভর করত। জমিদার ইচ্ছা করলেই কাউকে তার বাড়িতে বিনা পয়সায় গতর খাটাত। অত্যাচারের এখানেই শেষ নয়। জমিদারের হুকুমের নড়চড় হয়েছে তো, আর রক্ষে ছিল না। চাবুকের আঘাতে প্রজার রক্ত বরত। জমিদারের অত্যাচারে প্রজাকে পশুর মতো মাটিতে গড়াগড়ি খেতে হতো। কখনও বা জমিদার প্রজার বাড়ি নিলামে উঠাত।

বাংলার গরিব কৃষক ও মুসলমানদের এই দুর্দিনে চব্বিশ পরগনায় জন্ম নেন শিশু তিতুমীর। তাঁর প্রকৃত নাম সৈয়দ মীর নিসার আলী। ১১৮২ সালের ১৪ মাঘ বসিরহাটের চাঁদপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তিতুমীরের পিতার নাম মীর হাসান আলী এবং মাতার নাম আবিদা রোকেয়া খাতুন। তাঁর পরিবার ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা)-এর বংশ তালিকার সাথে যুক্ত বলে জানা যায়। তিতুমীরের পূর্বপুরুষ সাইয়েদ শাদাত আলী আরব থেকে বাংলায় এসে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। লেখাপড়ার প্রতি তিতুমীরের প্রচ-বোঁক ছিল। গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে তিতু এক মাদরাসায় ভর্তি হন। আঠারো বছর বয়সে তিতুমীর ‘কুরআনে হাফেজ’ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। একই সাথে তিনি হাদিসশাস্ত্রে পার্শ্বে লাভ করেন। এই সময়ে তিতুমীর আরবি, বাংলা, ফারসি ও অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

বাংলার গরিব কৃষকের ওপর তখন নীল কুঠিয়ালদের ভয়ানক অত্যাচার ও শোষণ চলছিল। এসব দেখে তিতুমীর মর্মাহত হতেন। ব্রিটিশ শাসকের বৈষম্যনীতি এবং বর্ণ হিন্দুদের ঘৃণ্য মনোভাব তাঁর মনকে বিষিয়ে তুলল। এতে তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তাই এসব অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য তিতুমীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন। এ জন্য তিনি নিজেকে শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান করার মনস্থ করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ওস্তাদ হাফিজ নেয়ামত উল্লাহর কাছে শরীরচর্চা শুরু করেন। নিবিড় একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতার কারণে অল্পদিনেই তিতুমীর কুস্তি লাঠিখেলা, তলোয়ার ও ঢাল-সড়কির খেলায় পারঙ্গম হয়ে ওঠেন। এরই মধ্যে তিনি ঘরসংসার করলেন। বিয়ের

চৌদ্দ দিন পর বাবা হাসান আলী মারা গেলেন। এতে তিনি মর্মপীড়া পেলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর মানসিক দৃঢ়তায় ছেদ পড়েনি। এ সময় তিনি কলকাতায় চলে আসেন। ১৮২২ সালের কথা। তিতুমীরের বয়স তখন ঊনচল্লিশের কোঠায়। এ বছর হজব্রত পালনের জন্য তিনি মক্কায় গমন করেন। সেখানে তাঁর সাথে আরেক বিপ্লবী নেতার সাক্ষাৎ ঘটল। নাম সৈয়দ আহমদ। বেরেলির এই বীরও ভারতের মাটি থেকে ব্রিটিশ বেনিয়াদের তাড়াতে সংগ্রাম করছিলেন। তিতুমীর সৈয়দ আহমদের স্পর্শে এসে বিপ্লবী চিন্তাধারায় উজ্জীবিত হন। ১৮২৭ সালে তিনি যথারীতি দেশে ফিরে আসেন। এরপর তিনি আর বসে থাকলেন না। শুরু হলো কাক্সিক্ষিত আন্দোলনের প্রস্তুতি। সমাজ থেকে শিরক ও বিদয়াত দূর করা এবং মুসলমানদের এর কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করা ছিল তিতুমীরের প্রাথমিক কাজ। পাশাপাশি অত্যাচারিত অসহায় কৃষকদের জমিদারের শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্ত করা ছিল তাঁর অন্যতম বড় কাজ। দেখতে দেখতে তিতুমীরের আন্দোলনে জোয়ার এলো। সমাজের অনেক মানুষ তাঁর কথায় আকৃষ্ট হলো। ফলে কায়েমি স্বার্থবাদীরা নড়েচড়ে উঠল। জমিদাররা খাজনা ও ক্ষমতা হারানোর ভয়ে তাঁর ওপর প্রচ- রেগে গেল। শিরকপন্থী ড- পীরগণ তাদের স্বার্থের ব্যাঘাত দেখতে পেয়ে ক্ষিপ্ত হলো। আর সুদখোর অত্যাচারী মহাজনরা অর্থ লুটের সুযোগ হারাবার ভয়ে দারুণ ক্ষেপে গেল। ফলে তিতুমীরের বিপক্ষে সবাই একাট্টা হলো। তখনকার জমিদার ছিল কৃষ্ণদেব। তিতুমীর এই অত্যাচারী ও শোষণ জমিদারকে সতর্ক করার জন্য চিঠি দিলেন। চিঠি পেয়ে কৃষ্ণদেব ক্ষিপ্ত হলো এবং চিঠির বাহক আমিন উল্লাহকে অত্যাচারে জর্জরিত করল। এতে আমিন উল্লাহ শাহাদাতবরণ করলেন। আমিন উল্লাহর মৃত্যুর ঘটনা চব্বিশ পরগনার নারকেলবাড়িয়ার মানুষকে উত্তেজিত করে তুলল। তারা তিতুমীরের সাথে এসে যোগ দিলেন এবং প্রতিরোধ আন্দোলনের শপথ নিলেন। জমিদারের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে সবাই জোট বাঁধলেন। তিতুমীর গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে গঠন করলেন মুক্তিবাহিনী। দেখতে দেখতে তাঁর বাহিনীতে পাঁচ হাজার মুজাহিদ এসে জড়ো হলেন। তারা সশস্ত্র সংগ্রামের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করলেন। তিতুমীর তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করলেন। ১৮৩১ সালে তিনি বারসাতের কাছে নারকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেলা তৈরি করলেন। তারপর তিনি হিন্দুস্তান থেকে ইংরেজ রাজত্ব খতম করার ঘোষণা দিলেন। তিনি মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে পাততাড়ি গুটাতে হবে।

এ দেশ আমাদের। আমরাই এ দেশ শাসন করব। জমিদাররা আর কোম্পানিকে খাজনা দিতে পারবে না। খাজনা দিতে হবে জনগণের সরকারকে।’ তিতুমীরের এ ঘোষণা ত্বরিত গতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। জনগণ জমিদারকে খাজনা দিতে অস্বীকার করল। ফলে এ বছর ছয় নভেম্বর কৃষ্ণদেবের সাথে তিতুমীরের বাহিনীর যুদ্ধ বাধল। হেরে গেল কৃষ্ণদেব। তারপর গোবরডাঙ্গার জমিদার কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, তারাগোনিয়ার জমিদার রাজনারায়ণ, নাগপুরের গোরিপ্রসাদ চৌধুরী, গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রাইরা তিতুমীরের বিদ্রোহে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু তারা সফলকাম হলো না। মোল্লাহাটির নীলকুটির ম্যানেজার ছিলেন ডেভিস নামে এক ইংরেজ। অন্যান্য হিন্দু জমিদারের সহায়তা নিয়ে সে তিতুমীরকে শাস্তি করার পরিকল্পনা করল। ডেভিসের নেতৃত্বে তিতুমীরের বাহিনীর ওপর আক্রমণ করা হলো। কিন্তু ডেভিস পরাজিত হয়ে গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদারের কাছে আশ্রয় নিলো। এই জমিদারও তিতুমীরের সাথে লড়াই করল। তবে তার দল পরাজিত হলো এবং জমিদার নিহত হলো। তারপরও তিতুমীরের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ বেনিয়া ইংরেজ ও এ দেশীয় জমিদারের লড়াই খামল না। তারা তিতুমীরের আন্দোলন নির্মূল করতে প্রাণান্তকর চেষ্টা করল। আলেকজান্ডার নামক এক হাবিলদারের নেতৃত্বে নারকেলবাড়িয়ায় আক্রমণ চালানো হলো। কিন্তু তিতুমীরের সৈনিকদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে আলেকজান্ডার পালিয়ে কোন রকমে জান বাঁচাল। এ নিদারুণ পরাজয়ে ইংরেজদের টনক নড়ল। এ হারের মধ্যে তারা রাজত্বের আশু পতনের ইঙ্গিত দেখতে পেল। ফলে তারা এর একটা বিহিত করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলো। তিতুমীরকে যেভাবেই হোক হারাতে হবে, এই প্রত্যয় নিয়ে ইংরেজরা পরিকল্পনা আঁটল। ইংরেজ গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিন্গ তিতুমীরের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে এগিয়ে আসল। আশপাশের জমিদারগণ ইংরেজদের সাথে এসে গাঁটছড়া বাঁধল। ফলে একটা ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠল।

১৪ নভেম্বর। ১৮৩১ সাল। ঐতিহাসিক বাঁশের কেলা আক্রমণ করে তিতুমীর ও তাঁর বাহিনীকে পরাস্ত করার কাজ শুরু হলো। একজন কর্নেলের নেতৃত্বে এক শ’ গোরা সেনাসহ তিন শ’ দেশী সিপাই নারকেলবাড়িয়ার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। সাথে যোগ দিলো আরো বহু সশস্ত্র কুলি। ইংরেজদের সাথে ছিল দু’টি কামান। কর্নেল রাতেই নারকেলবাড়িয়ার গ্রাম ঘেরাও করে ফেলল। মুজাহিদরা ইট-পাথর

ছুঁড়ে ইংরেজ বাহিনীকে পিছু হটাল। তবে কর্নেল চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য ভোরবেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। এ দিকে তিতুমীর বুঝতে পারলেন কেব্লা এখন এক কঠিন আক্রমণের শিকার। আলামত মোটেও ভালো নয়। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। তাই শেষরাতে তিতুমীর মনভরে আল্লাহর ইবাদাত করলেন, তাঁর সাহায্য চাইলেন। দ্রুত সুবহে সাদিক ঘনিয়ে এলো। ফজরের নামাজের জন্য মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসছিল আজানের ধ্বনি। এমন সময় সিপাহসালার তিতুমীর সকলকে নিয়ে কেব্লায় একত্র হলেন। তিনি বললেন, ‘আমার ভাইয়েরা! আজ আমরা কঠিন পরীক্ষার সন্মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। ইংরেজ সিপাইরা আমাদের কেব্লার ফটক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আমাদের জীবনে আজ এক সোনালি দিগন্ত। হয় আমরা গাজি হবো, ইংরেজদের এ দেশ থেকে তাড়িয়ে আল্লাহর হুকুমত কায়ম করব। না হয় আমরা আল্লাহর পথে শহীদ হবো। এতে আমাদের ভয় নেই। আর তোমাদের যারা বেঁচে থাকবে, তারা আল্লাহর হুকুম তালিম করতে ভুলে যেও না। এ জন্য সকল আপদ-বিপদ মাথা পেতে নিও।’ সকলে ‘আল্লাহু আকবার’ ধ্বনি তুলে নেতার কথার সাথে ঐকমত্য পোষণ করল। কালো আঁধারের চাদর ফেঁড়ে ভোরের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এমন সময় শুরু হলো তুমুল এক যুদ্ধ। ইংরেজ সিপাইরা মুজাহিদদের প্রতি গুলিবর্ষণ শুরু করল। কিন্তু মুজাহিদদের কাবু করতে পারল না। বরং মুজাহিদদের ইট-পাথরের অব্যর্থ আক্রমণে ইংরেজ বাহিনীতে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটল। সেনাপতি কর্নেল এবার কামান দাগাল। প্রথমে কামানের ফাঁকা গোলা ছুড়ে মুজাহিদদের আত্মসমর্পণের চেষ্টা করা হলো। তাতেও কোন কাজ হলো না। এবার কর্নেল কামান যুদ্ধ শুরু করল। মুহূর্তে কামানের গোলার বিকট শব্দে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠল। নারকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেব্লা প্রচ-ভাবে কেঁপে উঠল। অবিরত গোলার আঘাতে ক্ষণিকের মধ্যেই কেব্লা গুঁড়িয়ে গেলে কেব্লার নিচে চাপা পড়ে মুজাহিদদের অনেকেই হতাহত হলেন। তারপরও মুজাহিদদের মনোবল এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা স্তিমিত করা গেল না। দেখতে দেখতে হঠাৎ কামানের একটি গোলা তিতুমীরের কাছাকাছি এসে পড়ল। গোলার আঘাতে তিতুমীরের ডান উরু ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেল। এরপরও মর্দে মুজাহিদদের মনের ক্ষিপ্ততা দমিত করা গেল না। তাঁর চোখে মুখে লড়াই করার ক্ষিপ্ততা উদ্ভাসিত হচ্ছিল। এ কঠিন সময়ে তিনি মুজাহিদদের সম্বোধন করে বললেন, ‘বন্ধুরা! বাঁশের কেব্লায় আগুন জ্বলছে।

আগুন ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। নারকেলবাড়িয়ার পতন হলেও আমাদের লড়াই কিন্তু শেষ হবে না। তোমরা লড়াই চালিয়ে যাও।’

এর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ইতিহাসের অন্যতম মহানায়ক তিতুমীর শাহাদাতের স্বাদ গ্রহণ করলেন। তাঁর সাথীদের অনেকেই শাহাদাতবরণ করলেন। আহত হলেন অনেকে। বন্দী হলেন আটশ। আপাতত নারকেলবাড়িয়ার পতন ঘটল। এর পর বেনিয়া ইংরেজরা বন্দীদের নিয়ে বিচারের নামে প্রহসনের আয়োজন করল এবং তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদ- প্রদান করল। মুজাহিদদের সেনাপতি মাসুদকে প্রাণদন্ডে দণ্ডিত করা হলো। এভাবে নারকেলবাড়িয়ায় মর্দে মুজাহিদ তিতুমীরের অধ্যায়ের শেষ হলো। তিতুমীর ছিলেন আপসহীন নেতা। ইসলামের একনিষ্ঠ এই সাধক দীন কায়েমের সংগ্রামে ছিলেন অটল-অবিচল। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শাহাদাতের পথ বেছে নিলেন, কিন্তু অন্যায়ের কাছে মাথা নত করলেন না। জীবনের বিনিময়ে তিনি সত্যের পথে লড়াই করলেন। তাঁর এই দৃঢ়তা ও অনবদ্য প্রেরণা আজও বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানকে অনুপ্রাণিত করে, আবেগতাড়িত করে। সত্যপথের যাত্রীরা তিতুমীরের আদর্শ নিয়ে আজও কাজ করছে। দুনিয়ার দেশে দেশে দীন প্রতিষ্ঠার কাজে তারা জীবন উৎসর্গ করছে। নারকেলবাড়িয়ার কেল্লার সেই বিপ্লবের আগুন নির্বাপিত হয়নি, বরং সে আগুন ছড়িয়ে গেছে সারা বিশ্বে। যেখানেই অন্যায়, সেখানেই আছে তিতুমীরের মতো সাহসী ও আপসহীন সৈনিক। কেউ এদের শেষ করতে পারবে না। কেননা, আল্লাহর পথে তিতুমীরদের মৃত্যু নেই।

ফেসবুকে এমন মহানায়কদের খোঁজ পেতেঃ

মহাকালের মহানায়ক

সূত্রঃ

<http://anonym.to/?http://lighthouse২...t/?postid=২৬৯১>

<http://anonym.to/?http://lighthouse২....htfsFaK8.dpuf>

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩৩৮>

মুসলমানদের স্বপ্নের রাষ্ট্র স্পেন

কাল পতাকা

Senior Member

০৮-২৬-২০১৫

তারেক বিন যিয়াদ ছিল মুসা বিন নুসাইর এর গোলাম। তারেক বিন যিয়াদ বর্বরদের সচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও উত্তম বংশ ডেভালে জন্মগ্রহণ করেন। মুসা বিন নুসাইর তারিক বিন যিয়াদের বিচক্ষণতা, যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে পারদর্শীতা, সততা, আরবী ভাষায় বাগ্মীতা অন্যান্য গুণাবলী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তারিক বিন যিয়াদের ইসলাম গ্রহণের পর তার এই নাম রেখেছিলেন মুসা বিন নুসাইরই। তিনি তারিকের যোগ্যতা দেখে তাকে নায়েবে সালার পদে আসীন করলেন। অবশেষে এই গোলাম পেয়ে গেলেন স্পেন অভিজানে সেনাপতির দায়িত্ব।

তারেককে যে ফৌজ দেয়া হয়েছিল তার সংখ্যা ছিল সাত হাজার। এর মাঝে কয়েকশ সোয়ারীও ছিল। তাবৎ ফৌজ ছিল বর্বর। তাদেরকে টাংগের থেকে স্পেনে পৌঁছানোর জন্য বড় চারটি জাহাজ ব্যবহার করা হয়েছিল। যখন জাহাজ নোঙ্গর তুলে নিল তখন তীরে সমবেত হাজার হাজার নর-নারী ও শিশু-কিশোর দু'হাত উপরে তুলে তাদের জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করছিল। জাহাজের পালে হাওয়া লাগার পর তা দূরে চলে যেতে লাগল। রমণীদের নয়নযুগলে অশ্রুর বান বয়ে গেল।

এ সাত হাজার ফৌজের অধিকাংশের ভাগ্যেই ছিল স্পেনে দাফন। তারা আল্লাহর পয়গাম সমুদ্রের অপর পারে পৌঁছানোর জন্যে চিরতরে বিদায় হয়ে যাচ্ছিল। সে ঐতিহাসিক তারিখটি ছিল, ৭১১ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুলাই।

জাহাজে আরোহণ করার কিছুক্ষণ পর তারিক বিন যিয়াদ ঘুমিয়ে পড়েন এবং গভীর রাতে স্বপ্নে তিনিসাইয়িদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নূরে মুজাসসাম হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, উনার জিয়ারত লাভ করেন।

রহমতুল্লিল আলামীন হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে আশ্বস্ত করে বলেন, “হে জিয়াদ! তুমি অগ্রসর হও। চিন্তিত হইওনা, তুমিই কামিয়াবী লাভ

করবে।” এই স্বপ্ন দেখে হযরত তারিক বিন জিয়াদ রহমতুল্লাহি আলাইহি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অগ্রসর হন। তিনি যখনঘুম থেকে জেগে মুজাহিদদেরকে এই সুসংবাদ দিলেন তখন মুজাহিদদের সাহস ও জজবা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সমস্ত সৈন্য নিয়ে উপকূলের যেখানে জাহাজ ভিড়েছিল তার নাম ছিল কিপলী, পরবর্তিতে যা জাবালুত তারিক বা জিব্রাল্টার নামে প্রসিদ্ধ হয়।

সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী স্পেন উপকূলে নামার পর তারিক বিন যিয়াদ জাহাজের মাল্লাদের নির্দেশ দিলেন, “সব কাটি জাহাজে আগুন লাগিয়ে দাও।” তার নির্দেশের পর সবকাটি জাহাজে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল।

জাবালুত-তারেকের বর্তমান চিত্র(ইবরাহিম আল ইবরাহিম মসজিদ সহ)

তারেক বিন যিয়াদ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে ‘জাবালে ফাতাহ ’ বা জাবালে তারেক(জিব্রাল্টার) এর উপকূলে অবতরণ করেছিলেন। সেখান থেকে সবুজ উপদ্বীপ পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকায় তিনি উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন না হয়ে জয় করেন। কিন্তু তারপর রডারিক তার বিখ্যাত সেনাপতি

থিওডমীরকে(Theodomir) বিশাল এক সেনাবাহিনী সহ তারেকের মোকাবেলা করার জন্য প্রেরণ করে। মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে থিওডমীরের পরপর অনেকগুলো লড়াই হয়। আর প্রতিটি লড়াইয়ে সে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এমনকি একাধারে পরাজয় বরণ করতে করতে সে সাহসহারা হয়ে পড়ে। তখন সে রডারিককে পত্রযোগে জানায় যে, “ এমন এক জাতির আমি মুখোমুখি হয়েছি, যারা বড় বিস্ময়কর এক জাতি। তারা আসমান থেকে নেমে এসেছে নাকি জমিন ফুঁড়ে উঠে এসেছে তা’ অল্লাহই ভাল জানেন। এখন আপনি নিজে অকুতোভয় সেনাদের সমন্বয়ে গঠিত বিশাল এক সেনাবাহিনী নিয়ে তাদেরকে প্রতিরোধ না করলে তাদের সাথে মোকাবেলা করা কোনভাবেই সম্ভবপর নয়।”

রডারিক তার সেনাপতির পত্র পেয়ে প্রায় একলাখ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী তৈরি করেন তারেকের সাথে মোকাবেলা করার জন্য।

এদিকে তারিক মুসা বিন নুসাইয়ের কাছে আরো সৈন্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে মুসা বিন নুসাইর আরো পাঁচ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। ফলে তারিকের মোট সৈন্য সংখ্যা বারো হাজারে উপনীত হয়।

লাক্সা প্রান্তরে উভয় বাহিনী লড়াইরের জন্য মুখোমুখি হলে তারেক বিন যিয়াদ এক ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন, যে ভাষণের প্রতিটি শব্দ থেকে তারেক বিন যিয়াদের অবিচল সংকল্প, উচ্চ সাহসিকতা এবং আত্মনিবেদনের সুতীর্থ আবেগ প্রকাশ পেয়েছিল।

তারেকের মুজাহিদ সঙ্গীরা পূর্ব থেকেই জিহাদীন চেতনা ও শাহাদাতের বাসনায় উন্মত্ত ছিল। তারেকের জ্বালাময়ী এ ভাষণ তাদের অন্তরে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। তারা দেহ-মনের কথা বিস্মৃত হয়ে লড়াই করেন। একাধারে আটদিন পর্যন্ত এ লড়াই অব্যাহত থাকে। এদিন গুলোতে তারা যেভাবে যুদ্ধ করছিল তা আসলেই অতুলনীয়। তাইতো কবি ইকবাল তারেক বিন যিয়াদের ভাষায় সে সমস্ত আল্লাহ-পাগল মুজাহিদদের সম্পর্কে বলেছেন-

" দিদিজয়ী যোদ্ধা এসব, তোমার আজব বান্দা এঁরা, হৃদয়ে যাঁদের দিয়েছো তুমি, তোমার প্রেমের আকুলধারা।

ময়দানে যাঁরা আঘাত হানে, দরিয়ায় তুলে ঝড়-তুফান, শৌর্যে যাঁদের পর্বতমালা, ভেঙ্গে চূরে হয় খান খান।"

পরিশেষে মুসলমানগণ আল্লাহর সাহায্য লাভ করেন এবং বিজয় তাদের পদচুম্বন করে। রডারিকের বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করে পালিয়ে যায়। রডারিক নিজেও ঐতিহাসিক এ লড়াইয়ে নিহত হয়। কোন কোন বর্ণনায় জানা যায় যে, তারেক বিন যিয়াদ নিজেই তাকে হত্যা করেন, আর কোন কোন বর্ণনামতে তার শূন্য ঘোড়া সাগরতীরে পাওয়া যায়, যে কারণে অনুমান করা হয় যে, সে সাগরে ডুবে মারা গেছে।

লাক্সা প্রান্তরের দীর্ঘ এক সপ্তাহব্যাপী বড় ধৈর্যসংকুল এই লড়াইয়ে মুসলমানদের অর্জিত বিজয় ইউরোপে মুসলমানদের অনুপ্রবেশের ভূমিকা ছিল। এ বিজয় মুসলমাওন্দের জন্য সমগ্র ইউরোপের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। এরপর মুসলমানগণ স্পেনের সমস্ত শহর পদানত করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে।

তাদের সাথে তখন মুসা বিন নুসাইরও তার বাহিনী সহ যোগদান করেন। তারা স্পেনের তৎকালীন রাজধানী টলেডো (Tollido)-কেও জয় করেন। তারপরেও তাদের অগ্রাভিজান অব্যাহত থাকে এমনকি তারা ফ্রান্সের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পিরনীজ পর্বতমালার পাদদেশে পৌঁছে যায়। ঐতিহাসিক গিবন লিখেছেন, "মুসা ইবনে নুসাইর একবার ফ্রান্সের এক পাহাড়ের চূড়ায় চড়ে পুরো ফ্রান্সকে পর্যবেক্ষণ করে বললেন, তিনি আরব সৈন্যদের তার বাহিনীকে शामिल করে ইউরোপকে বিজয় করে কমন্ট্যান্টিপোল পৌঁছবেন এবং সেখান হতে নিজ দেশ সিরিয়াতে প্রবেশ করবেন।"

কিন্তু খলিফার নির্দেশে তাদের অগ্রাভিজান থামিয়ে দিতে হয়। তা না হলে হয়ত আজ ইউরোপের ইতিহাস অন্যভাবে লিখতে হত। তাইতো ঐতিহাসিক গিবন লিখেছেন, "যদি ঐ

মুসলমান জেনারেল সম্মুখে অগ্রসর হবার সুযোগ পেতেন, তাহলে ইউরোপের স্কুলে ইঞ্জিলের পরিবর্তে কুরআন পড়ানো হতো এবং আল্লাহর একত্ববাদ ও মুহাম্মাদের রিসালাতের সবকিছু দেওয়া হতো। আর আজকে রোমে পোপের পরিবর্তে শায়খুল ইসলামের হুকুম কার্যকর হতো।"

স্পেনে গিয়ে মুসলমানরা করডভায় একটি মসজিদ নির্মান করে। মসজিদটি দেখে সে সময় মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে কতটা উন্নত ছিল তা জানা যায়। মসজিদটির আয়তন ৩৫১৫০ বর্গ গজ। প্রায় ৩৫০০ পিলিয়ার বিশিষ্ট এ মসজিদে সূর্যের তাপ প্রবেশের জন্য রয়েছে ৩৬৫ টি স্তম্ভ যাতে প্রতিদিন মসজিদ আলোকিত হয়। সারা স্পেনে তৈরি হয় হাজারো মসজিদ।

শুধুমাত্র থানাডা শহরেই ছিল ১৭০০ মসজিদ কিন্তু হয় আফসোস একসময় যেই মসজিদ আল্লাহ উ আকবর ধোনিতে মুখোরিত ছিলো সেই মোসজিদেই আজ খ্রিষ্টানদের ঘন্টা বাজে সেখানে ওজু করতে দেওয়া হয় না নামায তো দূরে থাক খালি পায়ে ধোকা জায় না জুতা পোরে ধোকতে হয় মুসলিমরাই সোর্বোপ্রথম খ্রিষ্টানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেয় সেখানে তৈরি কোরে আল-মাদরাসা নামক বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে খ্রিষ্টানরা শিক্ষা গ্রহন কোরে যার কিনা বর্তমান নাম লা-মাদরায়া ।

৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মে মাসারার যুদ্ধের পর থেকে স্পেনের ওপর খ্রিষ্টানদের নানামুখী আগ্রাসন ও সম্ভ্রাস চলতে থাকে। ফলে স্পেনের নিরাপত্তা হয়ে পড়ে হুমকির সম্মুখীন। কিন্তু স্পেনের ভেতরে পচন ধরার প্রাথমিক সূত্রগুলো তৈরি হচ্ছিল ধীরে ধীরে। সমাজের নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক বোধ ও সচতেনতা ধীরে ধীরে হারাতে শুরু করছিল। রাজনৈতিক নেতৃবর্গ রাষ্ট্রের শত্রু-মিত্র বিভাজনের কাণ্ডজ্ঞান থেকে সরে আসছিল দূরে। এদিকে ইউরোপের আকাশে ক্রুসেডের গর্জন শোনা যাচ্ছে। স্পেনের বিরুদ্ধে যে আক্রোশ কাজ করছিল সেটাই তিনশ' বছরে পরিপুষ্ট হয়ে ১০৯৭ সালে গোটা ইসলামী দুনিয়ার বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠে ভয়াবহ তুফানের মতো। ১০৯৮-এর জুনে এন্টয়িক দখলের সাফল্যজনক কিন্তু নৃশংস ঘটনার মধ্য দিয়ে উত্তাল হয়ে ওঠা এ তুফান ১২৫০ সালে অষ্টম ক্রুসেডের পরিসমাপ্তির পর স্পেনের দিকে মোড় ঘোঁরায়। স্পেনে তখন সামাজিক সংহতি ভঙ্গুর। খ্রিস্টান গোয়েন্দারা ইসলাম ধর্ম শিখে আলেম লেবাসে বিভিন্ন মসজিদে ইমামতিও করছে। তাদের কাজ ছিলো স্পেনের সমাজ জীবনকে অস্থিতিশীল ও শতচ্ছিন্ন করে তোলা।

১৪৬৯ সালে ফাঁডিনান্ড ও ইসাবেলা স্পেনে মুসলিম সভ্যতার অস্তিত্বকে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য পরস্পর বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৪৮৩ সালে ফাঁডিনান্ড ও ইসাবেলা একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী পাঠান মালাগা প্রদেশে। যাদের প্রতি হুকুম ছিল শস্যক্ষেত্র জ্বালিয়ে দেয়া, জলপাই ও দ্রাক্ষা গাছ কেটে ফেলা, সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ধ্বংস করা, গবাদিপশু তুলে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। সেই সময় মৃত্যু ঘটে স্পেনের শাসক আবুল হাসান আলীর। শাসক হন আজজাগাল। এক পর্যায়ে প্রাণরক্ষা ও নিরাপত্তার অঙ্গীকারের ওপর নগরীর লোকেরা আত্মসমর্পণ করলেও নগরী জয় করেই ফাঁডিনান্ড চালান গণহত্যা। দাস বানিয়ে ফেলেন জীবিত অধিবাসীদের। এরপর ফাঁডিনান্ড নতুন কোনো এলাকা বিজিত হলে বোয়াবদিলকে এর শাসক বানাবে বলে অঙ্গীকার করে। ৪ ডিসেম্বর ১৪৮৯। আক্রান্ত হয় বেজার নগরী। আজজাগাল দৃঢ়ভাবে শত্রুদের প্রতিহত করলেন। কিন্তু ফাঁডিনান্ড কৌশলে খাদ্যাভাব ঘটে শহরে। ফলে শহরের অধিবাসী নিরাপত্তা ও প্রাণরক্ষার শর্তে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু তাদের ওপর চলে নৃশংস নির্মমতা। আজজাগাল রুখে দাঁড়ালে তাকে কারাগারে পাঠানো হয় এবং পরে করা হয় আফ্রিকায় নির্বাসিত। ডিসেম্বর ১৪৯১-এ গ্রানাডার আত্মসমর্পণের শর্ত নির্ধারিত হলো। বলা হলো :

‘ছোট-বড় সব মুসলমানের জীবনের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হবে। তাদের মুক্তভাবে ধর্ম-কর্ম করতে দেয়া হবে। তাদের মসজিদ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অক্ষত থাকবে। তাদের আদবকায়দা, আচার-ব্যবহার, রাজনীতি, ভাষা ও পোশাক-পরিচ্ছদ অব্যাহত থাকবে। তাদের নিজেদের আইনকানুন অনুযায়ী তাদের প্রশাসকরা তাদের শাসন করবেন...!’

আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেন মুসা বিন আকিল। তিনি বললেন, গ্রানাডাবাসী! এটা একটা প্রতারণা। আমাদের অঙ্গরে পরিণত করার জ্বালানি কাঠ হচ্ছে এ অঙ্গীকার। সুতরাং প্রতিরোধ! প্রতিরোধ!! কিন্তু গ্রানাডার দিন শেষ হয়ে আসছিল। ১৪৯২ সালে গ্রানাডাবাসী আত্মসমর্পণ করল।

রানী ইসাবেলা ও ফার্ডিনান্ডের মধ্যে শুরু হলো চুক্তি লঙ্ঘনের প্রতিযোগিতা। চারদিকে চলছিল ভয়াবহ নির্ধাতন। পাইকারি হারে হত্যা বর্বরতার নির্মম শিকার হতে থাকলেন অসংখ্য মুসলমান। স্পেনের গ্রাম ও উপত্যকাগুলো পরিণত হয় মানুষের কসাইখানায়। যেসব মানুষ পর্বতগুহায় আশ্রয় নিয়েছিল, তাদেরও মেরে ফেলা হলো আগুনের ধোঁয়া দিয়ে। পহেলা এপ্রিল, ১৪৯২। ফার্ডিনান্ড ঘোষণা করলেন, যেসব মুসলমান গ্রানাডার মসজিদগুলোতে আশ্রয় নেবে, তারা নিরাপদ। লাখ লাখ মুসলমান আশ্রয় নিলেন মসজিদগুলোতে। ফার্ডিনান্ড লোকেরা সবগুলো মসজিদে আগুন লাগিয়ে দিল। তিনদিন পর্যন্ত চললো হত্যার উৎসব। ফার্ডিনান্ড লাশপোড়া গন্ধে অভিভূত হয়ে হাসলেন। বললেন, হায় মুসলমান! তোমরা হলে এপ্রিলের বোকা (এপ্রিল ফুল)।

এই গণহত্যার পরও যেসব মুসলমান আন্দালুসিয়ায় রয়ে গিয়েছিলেন, তাদের ফার্ডিনান্ড ছেলে তৃতীয় ফিলিপ সহায়-সম্মলহীন অবস্থায় সমুদ্রপথে নির্বাসিত করেন। তাদের সংখ্যা ছিল পাঁচ লাখেরও বেশি। ইতিহাস বলে, তাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক লোকই জীবিত ছিলেন। বিপুলসংখ্যক মানুষ সমুদ্রের গহীন অতলে হারিয়ে যান চিরদিনের জন্য। এভাবেই মুসলিম আন্দালুসিয়া আধুনিক স্পেনের জন্ম দিয়ে ইতিহাসের দুঃখ হয়ে বেঁচে আছে। সেই বেঁচে থাকা বোয়াবদিলদের বিরুদ্ধে ধিক্কাররূপে ফার্ডিনান্ড বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদরূপে।

দুনিয়ার ইতিহাস কী আর কোনো আন্দালুসিয়ার নির্মম ট্রাজেডির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল? সম্ভবত হয়নি এবং হতে চায় না কখনও। স্পেন হয়ে আছে মুসলিম

উন্মাহর শোকের স্মারক। পহেলা এপ্রিল আসে সেই শোকের মাতম বুকো নিয়ে। শোকের এই হৃদয়ভাঙা প্রেক্ষাপটে মুসলিম জাহানের জনপদে জনপদে আন্দালুসিয়ার নির্মমতার কালো মেঘ আবারও ছায়া ফেলেছে। এশিয়া-আফ্রিকাসহ সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে মুসলিম নামধারী একশ্রেণীর বিশ্বাসঘাতক বোয়াবদিল এবং ক্রুসেডীয় উন্মত্ততার প্রতিভূ ফাঁড়িনাভদের যোগসাজশ। আন্দালুসিয়ার মুসলমানদের করুণ পরিণতি যেন ধৈর্যে আসতে চায় এই মানচিত্রের আকাশেও। এ জন্য পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক অঙ্গনে বিপর্যয়ের প্রলয়বাদ্য চলছে।। যে স্পেন এ আজান না দিলে সূর্য উঠতো না যে স্পেন এ আজান না দিলে সূর্য ডুবতো না সে স্পেন পরিনত হয় খ্রিষ্টানদের রাষ্ট্রে রোজ কিয়ামতের দিন এ স্পেন থেকে কত ওলি আউলিআ উতবেন তা আল্লাহ ই ভালো জানেন কবি আল্লামা ইকবাল বলেন ওহে স্পেন ও পরতুগিজ রা তোমরা যে বালুর উপর হাটো তার প্রতিটি বিন্দুতে মিশে আছে হাজারো আলেম ওলামার সিজদাহ। পরিশেষে বলা যায়, যে জাতি তরবারীর ছায়াতলে এ ভূমিতে তাকবীর ধ্বনীর ফোয়ারা উৎসারিত করেছিল, যে জাতি দীর্ঘ আটশ' বছর পর্যন্ত বিশ্ববাসীর নিকট থেকে নিজেদের দোদুলপ্রতাপের স্বীকৃতি আদায় করেছিল, তারা যখন বিলাসিতা, বাদ্য ও সঙ্গীতের তানে বিভোর হয়ে গাফলতের চিরনিদ্রায় শায়িত হল তখন এ স্বর্গভূমি তাদের হাতছাড়া হল আর সেখানে তাদের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন সেখানে অঙ্কত রইল না, যা হল অন্য আরেকটি ইতিহাস।

তার এ নির্দেশ অনেকেই মেনে নিতে পারছিলেন না, আর অনেকে এ চিন্তা করছিল ,এ নির্দেশ কেবল সে সিপাহসালার করতে পারে যার মেধা-বুদ্ধি বিকৃতি ঘটেছে, কারণ তারা মনে করছিল তারা তো স্বদেশভূমি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে, এখন তারা কিভাবে দেশে ফিরবে।তখন তারিক বিন যিয়াদ স্বহস্তে তরবারী উত্তোলন করে সে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন যা আজো ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাঙ্করে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং কিয়ামত तक থাকবে। সে ভাষণের সারমর্ম ছিল,'হে বাহাদুর যুবক ভাইয়েরা ! এখন পিছু হটবার ও পলায়ন করার কোন সুযোগ নেই। তোমাদের সম্মুখে দুশমন আর পশ্চাতে সমুদ্রানা পিছনে পলায়ন করতে পারবে না সামনে। এখন তোমাদের সামনে বিজয়লাভ বা শাহাদতবরণ

ছাড়া আর তৃতীয় কোন পথ অবশিষ্ট নেই। আর সব দেশই আমাদের দেশ, কারণ
এ সবই আমাদের আল্লাহর দেশ।

-সংগ্রহীত

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫৩৪>

শামেলী প্রান্তরের তপ্ত বারুদ.....

Mutmain

Junior Member

১২-২৭-২০১৫

১৮৫৭ সাল। ভারতবর্ষে তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন চলছে। ইতোমধ্যে ইংরেজদের অধীনে চাকুরীরত দেশীয় সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের দানা বাঁধে। শুরু হলো আযাদীর লড়াই। দিল্লী থেকে ইতোমধ্যে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ইংরেজবিরোধী জিহাদের ঘোষণা দিয়ে দেন।

এরই ধারাবাহিকতায় দিল্লীর অদূরে থানাভবনে সাযিয়্যুত তায়িফাহ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহ’র তত্ত্বাবধানে উলামায়ে কেরামের একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকের এজেন্ডা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ‘জিহাদের ঘোষণা’। বৈঠকে উপস্থিত সব উলামায়ে কেরাম জিহাদের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং দিল্লীর উলামায়ে কেরাম কর্তৃক ঘোষিত জিহাদের ফতোয়া সত্যায়ন করলেন। কিন্তু এক বুজুর্গ মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ খানবী রাহ জিহাদের বিপরীত মত দিলেন। তখন পঁচিশ বছর বয়েসী তরুণ আলেম মাওলানা কাসেম নানুতবী রাহ’র সাথে তাঁর চমৎকার কথোপকথন হয়।

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রাহ হযরত শায়খ মুহাম্মদ সাহেবকে সম্বোধন করে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিবেদন করলেন, হযরত কোন কারণে আপনি দ্বীন ও দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদকে ফরজ বরণ জায়েযও মনে করেন না?

হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ সাহেব মুহাদ্দিসঃ এজন্য যে, আমাদের কাছে অস্ত্র এবং সরঞ্জামাদি নেই। আমরা একেবারে নিরস্ত্র।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম সাহেবঃ আমাদের কাছে কি এতটুকু সরঞ্জামাদি নেই যতটুকু বদরযুদ্ধে ছিলো?

হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ সাহেব মুহাদ্দিসঃ যদি সকল যুক্তি এবং কথা মানাও যায়, তবে জিহাদের সবচেয়ে বড় শর্ত ইমাম (আমীর) নিয়োগ করা। আমাদের আমীর কোথায়? যাঁর নেতৃত্বে জিহাদ করা হবে?

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম সাহেবঃ আমীর নিয়োগে কি বেশি সময় লাগবে? মুরশিদে বরহক (সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নেতা) হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব বিদ্যমান আছেন, তাঁর হাতেই জিহাদের বায়আত নেওয়া যাবে।

তখন উপস্থিত অন্য বুজুর্গ হযরত হাফিজ জামিন সাহেব বললেনঃ মাওলানা, ব্যস! বুঝে গেছি। অতঃপর সবাই হযরত হাজী সাহেবের হাতে জিহাদের বাইয়াত নিলেন অর্থাৎ, রাষ্ট্রগঠনের জন্যে এ বাইয়াত ছিলো। এখন এই বাইয়াত হয়ে গেলো জান-মাল বিসর্জনের। (সূত্রঃ উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী/ পৃঃ ২৭৩-৭৪/ খন্ড ৪র্থ/ হযরত মাওলানা সাযিদ্ মুহাম্মদ মিয়াঁ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ) এরপর পরবর্তী কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ হযরত শায়খুল আরব ওয়াল আজম কুতবুল আলম শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী রাহ এভাবে বর্ণনা করেন –

অতঃপর জিহাদের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেলো এবং জিহাদের ঘোষণা দেওয়া হল। হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব রাহ'কে আমীর নিয়োগ করা হলো, হযরত মাওলানা কাসিম নানুতবী সাহেব রাহ'কে সেনাবাহিনীর প্রধান এবং হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহ'কে কাযী(বিচার বিভাগের প্রধান) নিয়োগ করা হয়। মাওলানা মুহাম্মদ মুনীর সাহেব নানুতবী রাহ ও হযরত হাফিজ জামিন সাহেবকে থানবীকে ডান ও বাম পার্শ্বের অফিসার নিয়োগ করা হয়। যেহেতু আশপাশের এলাকার মধ্যে উল্লেখিত হযরতগণ ইলম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন, এইসব হযরতগণের ইখলাস এবং খোদাভীরতার দ্বারা অনেক লোক প্রভাবিত ছিলো, তারা সর্বদা তাঁদের দীনদারী এবং আল্লাহভীতি দেখছিলেন, এজন্য তাঁদের উপর নির্ভর করে ফেলেন। তাছাড়া তাঁদের ছাত্র ও শিষ্যরা অভাবনীয় অনুরক্ত ছিলেন। এজন্য অল্প দিনেই দলে দলে লোকেরা এ কাফেলায় সমাগত হতে লাগলো। তখনপর্যন্ত অস্ত্রের উপর বিধি আরোপ ছিলো না, সাধারণতঃ লোকদের কাছে অস্ত্র থাকতো, যেগুলোকে রাখা এবং এর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করাকে মুসলমানরা আবশ্যক মনে করতেন। কিন্তু এ অস্ত্রগুলো পুরাতন মডেলের ছিলো। বন্দুকসমূহ টুটাবিশিষ্ট ছিল, কার্তুজ এবং

রাইফেল ছিলো না। এগুলো শুধু ইংরেজ সৈন্যদের কাছে ছিলো। যাক মুজাহিদরা সহস্রাধিক জড়ো হলেন, থানাভবন এবং আশপাশে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হলো। ইংরেজদের অধীনস্ত শাসককে বের করে দেওয়া হলো। ইতোমধ্যে খবর পৌঁছল, যে, তোপসমূহ ইংরেজরা শামেলীতে প্রেরণ করছে। এক প্লাটুন সৈন্য এগুলো নিয়ে আসছে। রাতে এ পথ দিয়ে অতিক্রম করবে। এই সংবাদ শুনে লোকদের মধ্যে অস্থিরতা বিরাজ করা শুরু হলো, কেননা যে সব অস্ত্র এই মুজাহিদদের হাতে ছিলো, এগুলো হচ্ছে তরবারী, বন্দুক এবং বর্শাসমূহ ইত্যাদি। কিন্তু তোপ কারো কাছে ছিলো না। তোপখানার প্রতিরোধ কীভাবে করা যাবে? হযরত গান্ধুহী বললেন, চিন্তা করিওনা।

সড়ক একটি বাগানের পার্শ্ব দিয়ে চলছে, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গান্ধুহী রাহ'কে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব ত্রিশজন মুজাহিদের অফিসার নিয়োগ করলেন। তিনি তাঁর অধীনস্তদের নিয়ে বাগানের ভেতর আত্মগোপন করলেন। সবাইকে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, যখন আমি নির্দেশ দিবো তখন সবাই এক সাথে ফায়ার করবে। ইংরেজদের প্লাটুন তোপখানাসহ বাগানের নিকটে পৌঁছল, তখন সবাই এক সাথে ফায়ার করলেন। প্লাটুন আতঙ্কিত হয়ে গেলো, যে, না জানি কতলোক এখানে আত্মগোপন করে আছে, তোপখানা ছেড়ে সবাই পলায়ন করলো। হযরত গান্ধুহী সাহেব তোপখানা নিয়ে হযরত হাজী সাহেবের মসজিদের সামনে নিয়ে উপস্থিত হলেন। এর দ্বারা লোকদের অন্তরে এইসব হযরতদের দুরদর্শীতা, ধী-শক্তি, রণকৌশলের দক্ষতা, অবস্থার পর্যালোচনা এবং সবধরনের যোগ্যতার ব্যাপারে বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেলো।

সেকালে শামেলী ছিলো কেন্দ্রীয় এলাকা, সাহারানপুর জেলার সাথে সম্পর্কিত ছিলো, সেখানে তাহশীলদারও ছিলো। সর্বদা কিছু সামরিকশক্তি সেখানে বিদ্যমান থাকত। সিদ্ধান্ত হলো সেখানে হামলা হবে। সুতরাং অপারেশন হলো এবং এলাকা নিয়ন্ত্রণ করা হলো, পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর যে শক্তি সেখানে ছিলো তাদেরকে পরাস্ত করা হলো। হযরত হাফিয় জামিন সাহেব এই লড়াইয়ে শহীদ হলেন। হযরত হাফিয় জামিন সাহেবের শহীদ হতেই পরিস্থিতি পালটে গেলো। তাঁর শাহাদতের পূর্বে প্রতিদিন সংবাদ আসতো যে, আজ অমুক জায়গা ইংরেজদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, আজ অমুক জায়গা ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কিন্তু হাফিয় সাহেবের শাহাদতের পর সংবাদ আসলো যে, দিল্লী ইংরেজ সৈন্যদের

নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এভাবেই প্রতি অঞ্চলের সংবাদ আসতে লাগলো। এরপূর্বে ইংরেজদের এদেশীয় দালাল সৈন্যরা লুকিয়ে চলাফেরা করতো, একেকজন আযাদী সৈন্যরা দালাল সৈন্যদের দল-উপদলকে তড়িয়ে দিত। কিন্তু পরে বিষয়টা উলটে গেলো। প্রথমে কোনো শস্য জমিতে যখন দালাল সৈন্য লুকিয়ে থাকত তখন কৃষক নারী তাকে লাঙ্গল দিয়ে হত্যা করে ফেলতো, কিন্তু পরে বিষয় উলটে গেলো। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ সালে ইংরেজ সৈন্যরা দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্যের শেষ স্মারক সম্রাট বাহাদুর শাহ জফরকে গ্রেফতার করে, পুরো দিল্লীতে ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। দিল্লীতে ধ্বংস-লুটতরাজ চালানোর পর কিছুদিনের মধ্যে ইংরেজ সৈন্যরা বিজয়ের বেশে থানাভবনের প্রাচীরে এসে তোপ স্থাপন করে। শহরবাসী পূর্ণ প্রতিরোধের প্রচেষ্টা করেন, কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্র ও সরঞ্জামাদির অপ্রতুলতার দরুন দু'ঘন্টার বেশি সময় যুদ্ধ স্থায়ী হয় নি। রাতে ইংরেজরা হামলা করে, এবং ভোর উঁকি দিতেই ‘থানাভবন ইমারাতে ইসলামিয়াহে’ (ইসলামি রাষ্ট্রে)’র পতন হয়ে যায়। ইংরেজদের প্রচন্ড গোলাবর্ষণে পুরো শহর ধ্বংসস্তপে পরিণত হয়ে যায়। এই যুদ্ধে থানাভবনের শহীদদের সংখ্যা হাজার অতিক্রম করে। এছাড়াও অনেক লোক গৃহ-বাড়ী ছেড়ে এলাকা ত্যাগ করেন।

এই যুদ্ধের পর হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহ আনুমানিক দু বছর আম্বালা, পাঞ্জালাসা, তাগরী ইত্যাদি এলাকার মধ্যে আত্মগোপন করতে করতে মক্কা মুকাররামার দিকে হিজরত করেন। হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহ’কে ইংরেজরা নয় মাস পর গ্রেফতার করে এবং ছয় মাস জিন্দানখানার লৌহকপাটে নির্যাতন ভোগ করেন। অতঃপর বৃটেনের রাণী কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা ঘোষণায় মুক্ত হন। হুজ্জাতুল ইসলাম কাসিম নানুতবী রাহ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত পুরো সময় লোক চক্ষুর আড়ালে থাকেন। (তেহরীকে আযাদীয়ে হিন্দ মৌ মুসলিম উলামা আওর আওয়াম কা কিরদার/ পৃঃ ৫৯-৬১/ মুফতি মুহাম্মদ সালমান মনসুরপুরী) এভাবেই শামেলী ময়দানের তপ্ত বারুদের গর্জন ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়ে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীতে এইসব মুজাহিদদের হাতেই ১৮৬৬সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যানিকেতন দারুল উলুম দেওবন্দ।

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৫২৩>